BL College Journal
Full PDF
www.blcollege.edu.bd
ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -IV, Issue-II, December 2022
Pp. 53-70

প্রফুল্লরঞ্জন বিশ্বাসের হাসির গান : স্বরূপ ও স্বাতন্ত্র্য

সুরঞ্জন রায়

সুরঞ্জন রায়
অবসরপ্রাপ্ত সহকারি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
শহীদ আব্দুস সালাম ডিগ্রি কলেজ
কালিয়া, নড়াইল, বাংলাদেশ
e-mail : suranjan.research@gmail.com

সারসংক্ষেপ

লোককবি প্রফুল্লরঞ্জন বিশ্বাসের প্রসিদ্ধি বহুমাত্রিক। তিনি মূলত গানের রচয়িতা হলেও তার মধ্যে বিষয় বৈচিত্র্যের পাশাপাশি আছে অন্য রকম মাত্রাবোধ, যা তাঁকে স্বাতন্ত্র্য এনে দিয়েছে। বাংলা সাহিত্যে হাসির কবিতা ও গান সংখ্যাল্প হলেও, যে ক'জন কবি ও গীতিকারের হাতে সফলতা পেয়েছে তাঁদের মধ্যে প্রফুল্লরঞ্জন স্বরূপত স্বতন্ত্র। তাঁর উপস্থাপন কৌশল অন্য কবিদের মতো নয়। তিনি একটি ভিন্ন বোধ থেকে গ্রামীণ মানুষের অদৃশ্য জীবনচিত্র তাদের নিজস্ব ভাষায় তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। ফলে ভাষা এবং ছবি ভিন্ন রঙে, ভিন্ন আঙ্গিকে, ভিন্ন পরিবেশে এবং ভিন্ন আলাপচারিতার মধ্য দিয়ে একটি অন্য রকম জীবনভাষ্যের প্রতিনিধিত্ব করছে। এ গবেষণাকর্মটি সেই ভাষ্যের অদৃষ্টপূর্ব উপস্থাপন।

মূলশব্দ

হাসির গান, আঞ্চলিক ভাষা, স্বরূপ, স্বাতন্ত্র্য, humour, wit, fun, farce, satire

ভূমিকা

হাসি মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। হাসির উৎস মন হলেও অভিব্যক্ত হয় দেহে। আনন্দের হলেও নিরানন্দ বা দুঃখের বহিঃপ্রকাশ হয় হাসির মধ্য দিয়ে। বিষয়টি বিশ্লেষিত হয়েছে প্রসিদ্ধ মনস্তত্ত্ববিদ William McDougall-এর *Social Psychology* গ্রন্থে।[১] হাসির দেহতত্ত্ব (Physiology) নিয়ে প্রবন্ধ লেখেন হার্বার্ট স্পেন্সর। তিনি বলেন যে, স্বাভাবিকভাবে কোনো আবেগের দ্বারা মানুষের শিরা উত্তেজিত হলে, সেই শিরা-সংযুক্ত পেশীগুলোতে উত্তেজনা সঞ্চার করে, তখনই সৃষ্টি হয় হাসির। তবে হাস্যোৎপাদনের বিপরীত ক্রিয়া হলে হাসি থেমে যায়।[২] উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ডারউইন হাসির অভিব্যক্তি নিয়ে বলেন যে, মানুষের ঠোঁটের সঙ্গে চোখের গোলাকৃতি পেশীর, অর্থাৎ Orbicular Muscles-এর সংযোগ আছে। হাসবার সময় ঠোঁট ও পেশীর ক্রিয়া এক সঙ্গে দেখা যায় বলে এ সময় চোখ দুটো উজ্জ্বল ও সিক্ত হয়ে ওঠে। এর কারণ চোখের গোলাকৃতি পেশীর সংকুচন ও ঊর্ধ্বে উন্নীত গণ্ডের পেষণ।[৩] এ হলো হাসির দেহতত্ত্ব।

সাহিত্য-দর্পণ-কার বিশ্বনাথ কবিরাজ হাসিকে স্মিত, হসিত, বিহসিত, অবহসিত, অপহসিত ও অতিহসিত শ্রেণিতে ভাগ করে বলেন যে, স্মিত হাসিতে চোখ খুব সামান্যই বিকশিত ও ঠোঁট স্পন্দিত হয়; দাঁত একটু দেখা গেলে তা হসিত, মধুর সুরের হাসি বিহসিত, কাঁধ ও মাথা কেঁপে উঠলে তা অবহসিত, হাসতে হাসতে চোখে জল এলে তা অপহসিত, আর অঙ্গবিক্ষেপ ঘটলে হবে অতিহসিত।[৪] ইংরেজি ভাষায় স্বল্পহাসিকে Smile ও উচ্চহাসিকে Laughter বলা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

হাসতে পারে না এমন মানুষ দুর্লভ। এ কথা খুবই সত্যি যে, ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্যে হাসির কোনো বিকল্প নেই। সেই অ্যারিস্টটলের কাল থেকে শুরু করে বিশেষজ্ঞরা বলে আসছেন যে, হাসিতে ফুসফুস ও দেহযন্ত্রকে সতেজ ও সক্রিয় করে তোলে। এমনকি হাসির জন্যে বৃদ্ধি পায় হজমশক্তিও। এ জন্যে হাসিকে বলা হয়েছে স্বর্গীয় সম্পদ।[৫] আর যিনি মানুষকে হাসাতে পারেন, সমাজে তাঁর স্থান অনেক উঁচুতে। প্রাচীনকালে রাজাদের হাস্যোৎপাদক হিসেবে ভাঁড় বা বিদূষক থাকতো। তাঁরা রাজদরবারে ও দরবারের বাইরে যে রকম সমাদর পেতেন, আজকের দিনে হাস্যরসস্রষ্টারা (Humorist) অনুরূপ সমাদর পান। কেননা, হাস্যরস নয় রসের অন্যতম রস হিসেবে তাঁদের হাতে এমন সহৃদয় হৃদয় সংবাদী হয়ে ওঠে যে, কাব্যের আত্মাস্বরূপ রসসৃষ্টি হয় কালজয়ী। সেদিক থেকে লোককবি প্রফুল্লরঞ্জন বিশ্বাসের (১৯০০-৭২) রচিত কৌতুক বা রসপ্রধান গানগুলো উতরে গেছে কালের সীমা। তিনি একজন শিক্ষক ও বহুমাত্রিক গানের রচয়িতা হিসেবে মানুষের শ্রদ্ধা পেলেও, হাস্যরসাত্মক গানের রচয়িতা হিসেবে কম সমাদৃত হননি। সেই হাসির গানের রচয়িতা হিসেবে তিনি স্বরূপত কতখানি আলাদা তা অনুসন্ধানই এ গবেষণাপত্রের উদ্দেশ্য।

পদ্ধতি

বর্তমান নিবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে তুলনামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎস হিসেবে তাঁর রচিত ১৩৫টি হাসির গান এবং উনিশ শতকের কবি, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, কথা সাহিত্যিকদের রচনা দ্বৈতয়িক উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁদের রচনার সঙ্গে তুলনা করে প্রফুল্লরঞ্জনের হাসির গানের স্বাতন্ত্র্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রফুল্ল-পরিচিতি

তাঁর জন্ম হয়েছিলো ১৯০০ সালে ব্রিটিশ-ভারতের বৃহত্তর যশোর জেলার বিখ্যাত জনপদ কালিয়া থানার (বর্তমানে নড়াইল জেলার একটি উপজেলা) ছোটকালিয়া গ্রামে। পিতা গগনচন্দ্র বিশ্বাস, মা লক্ষ্মীরানী বিশ্বাস। পাঁচ সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন বড়। কালিয়া অঞ্চলে, বিশেষত নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে, তিনি ছিলেন প্রথম ম্যাট্রিকুলেশন। হয়তো সে কারণে, অথবা গান রচনা, ভালো অভিনয় ও নাটকের সংলাপ বলে দেয়ার জন্যে অনুন্নত নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও, তৎকালীন শিক্ষাবর্ধিষ্ণু ও উচ্চ রাজকর্মচারী অধ্যুষিত কালিয়াতে পেয়েছিলেন মর্যাদার আসন। শিক্ষক হিসেবে তিনি ১০টি স্কুলে প্রায় ৩৩ বছর শিক্ষকতা করেন। তাঁর প্রদেয় শিক্ষার আলো যেমন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলো, তেমনি গান মানুষের হৃদয়ভূমিকেও নাড়িয়ে দিয়েছিলো। অনেক কবিয়াল ও বয়াতি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে জারিগান ও কবিগানের আসরে তা পরিবেশনও

করতেন। তাঁর সমসাময়িক কবিয়াল বিজয় সরকার (১৯০৩-৮৫) ও মোসলেমউদ্দিন বয়াতির (১৩১০-৯৭) যখন মঞ্চ কাঁপানো প্রতাপ, তখন মঞ্চের বাইরে একজন নিভৃতচারী গান রচয়িতা হিসেবে তিনি যে মর্যাদা ও পরিচিতি পেয়েছিলেন তা অবিশ্বাস্য। এভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য গ্রামীণ শিল্পীর কণ্ঠে তিনি শুধু পরিবেশিত হননি, বিভিন্ন ব্যক্তি ও শিল্পীর গানের খাতায়ও জায়গা পেয়েছেন। তাঁর গানের জনপ্রিয়তার কথা বিবেচনা করে চিত্রশিল্পী এস এম সুলতান (১৯২৪-১৯৯৪) গান সংগ্রহ করে প্রকাশের উদ্দেশ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞাপনও দিয়েছিলেন। তাঁর বাল্যবন্ধু কবি বিপিন সরকার (১৯২৩-২০১৫) ১১১টি গানের পাণ্ডুলিপিও করেছিলেন।[৬] এ-সব বিষয় ছাড়া তাঁর আঞ্চলিক ভাষার গান, যাকে কৌতুক বা হাসির গান বলা হয়েছে, গাজীর গানের শিল্পীদের নান্দনিক পরিবেশনায় এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এছাড়া, বিজয় সরকারের সঙ্গে প্রতিবছর প্রফুল্লরঞ্জনের সঙ্ঘ, শাস্ত্রীয় আলোচনা, বিজয় ও প্রফুল্লরঞ্জনের গান পরিবেশনা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে এমন একটি সেতুবন্ধন হয়েছিলো, তা আজ অনালোচিত বিষয় হলেও, সেটি মৌখিক বা লৌকিক ধারার (Oral or folk) ইতিহাস।[৭] প্রফুল্লরঞ্জনের গানের বহুমাত্রিকতা বিজয়কে কত বেশি আন্দোলিত করেছিলো তার পরিচয় মেলে একটি শোকগীতি (Elegy) রচনার মাধ্যমে। জীবদ্দশায় তাঁদের ঘনিষ্ঠতা, একে অপরের গান সম্পর্কে সম্যক ধারণা, প্রফুল্লরঞ্জনের চরিত্র, তাঁর গানের পঠন-পাঠন, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণধর্মিতার পরিচয় পাওয়া যায় বিজয় সরকারের গানটিতে। সংহত ও পরিমিত ভাষায় রচিত একজন প্রয়াত কবির মূল্যায়ন :

আগের খেয়ায় চলে গেছে প্রফুল্ল গোঁসাই,
সে যে জাগ্রত এক হুঁশিয়ার মানুষ বুঝেছি আমরা সবাই।
তের শত উনআশি সাল, নূতন বর্ষ প্রথম মাসকাল
দোকান তুলে নৌকা খুলে তুলে দিল পাল,
গোঁসাই পাড়ি দিল সকাল সকাল ভাগ্যের বলিহারী যাই।
চিরকুমার শিক্ষা পরায়ণ মিষ্টভাষী শিষ্ট আচরণ,
সুচরিত্র রসিক মানুষ পবিত্র জীবন,
সে যে জ্ঞানী প্রেমিক ভক্ত সুজন এমন লোক বেশী না পাই। ...
ভাব ভাটিয়াল তত্ত্ব আধ্যাত্মিক, তামসিক আর রাজসিক সাত্ত্বিক
বিরহ বিচ্ছেদ গীতি আরো সামাজিক,
আমরা শুনে তার রচিত কমিক হাসির মঞ্চে আছাড় খাই।[৮]

প্রফুল্লরঞ্জনের গানের সংখ্যা প্রায় ৯৮৫টি। এ গানগুলোর মধ্য থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনের চেষ্টায় কিছু পরিবর্তন, কিছু সংযোজন করে বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। কবির নিজের চেষ্টায় এক ফর্মার একটি পুস্তিকা প্রকাশ প্রথম হলেও, এর পর পশ্চিমবঙ্গ ভারতের নদীয়া থেকে *প্রফুল্লগীতিমালা* নামে, বাগেরহাট ইউনাইটেড প্রেস থেকে একই রকম সংকলন, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সংগ্রহ *বাংলার বাউল ও বাউল গান* গ্রন্থে, কবি জসীম উদ্‌দীনের (১৯০৩-৭৬) *স্মৃতিরপটে*, মহসিন হোসাইনের *বৃহত্তর যশোরের কবি ও লোককবি* এবং এ জামান সম্পাদিত *যশোরের গীতিকার ও নাট্যকার* গ্রন্থে জীবনীসহ অনেক গান প্রকাশিত হয়েছে।

হাসির গান ও প্রফুল্লরঞ্জনের হাসির গান

হাসির বিভিন্ন পর্যায় বোঝাতে ব্যঙ্গ, রঙ্গ, তামাশা, ঠাট্টা, বিদ্রূপ, পরিহাস, রসিকতা, ভাঁড়ামি প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করা হয়। এ শব্দগুলো অলঙ্কার শাস্ত্রশাসিত হয়ে এক এক অর্থে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হলেও হাস্যবোধ আপেক্ষিক এবং মানুষের রুচি ও মানসিকতা নির্ভর। সামান্য বিষয়ে একজন হেসে গড়িয়ে পড়লেও হয়তো অনেকেই সেই বিষয়ে হাসার কোনো কারণই খুঁজে পায় না। হাসির শারীর-তত্ত্ব অনুযায়ী বয়স ভেদে পরিবর্তন হয়। তারও আছে নানা কারণ। কোনো কোনো বিষয়, ঘটনা, কাহিনি বা চরিত্র হাসির উদ্রেক করলেও, মূলত হাসির উপাদান নিহিত থাকে কোনো ঘটনা (Comic in situation), চরিত্র (Comic in character), কিংবা বাক্যবন্ধের (Comic in Words) মধ্যে। এ ছাড়া, অন্যের কোনো ভুল-ত্রুটি, দুর্বলতা অথবা অসঙ্গতি দেখেও হাসির সৃষ্টি হয়। আধুনিক সাহিত্যে এ-সব হাস্যরসের বিষয় হলেও প্রফুল্লরঞ্জনের গান কোনো চরিত্রের দুর্বলতা, অসঙ্গতির মধ্যে আঁটকে থাকেনি: বরং বাক্যবন্ধ ও গ্রামীণ জীবন কাহিনি নির্ভর হয়ে তা প্রসারিত হয়েছে অন্য জগতে। তাঁর গান অভাবিত; এমনকি এতই সূক্ষ্ম ও রঙমুক্ত যে, স্বভাবত যা আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়, সে রকম বিষয়ের উপস্থাপনায় ঋদ্ধ তাঁর হাসির গান। খেটে খাওয়া কৃষিভিত্তিক নিম্নবর্গের মানুষের মন কষাকষি নিয়ে গানের মধ্যে যে বয়ান উপস্থাপিত হয়েছে, বাংলা গানের ইতিহাসে তা একটি অনন্য বিষয়। তাছাড়া, ঝগড়া-বিবাদ, তা সে দুই সতীন, স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন, পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যেও কম বেশি সংঘটিত হয়। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদেও গালাগালির প্রসঙ্গ অনুক্ত নয়।[৯]

হাস্যরসের মধ্যে humourই শ্রেষ্ঠ। তবে অনুকম্পা ও সমবেদনা হাসিকে স্তব্ধ করে দেয়, কিন্তু humour-এর মধ্যে এ দুটোরই প্রাধান্য আছে। হাসির মধ্যে বুদ্ধি থাকলেও জলের বুদ্বুদের মতো ক্ষণস্থায়ী। humour জলের তলদেশস্পর্শী আবর্তন, এবং তা স্থায়ী ও দূরপ্রসারী।[১০] হিউমারে হাস্যোৎপাদক ও হাস্যাস্পদ উভয়েই সমান। Wit সজ্ঞান, সচেতন, বুদ্ধিদীপ্ত ও মননশীল। তার প্রকাশ এমনই যে, লেখক হাসাবেন কিন্তু হাসবেন না। হিউমার আবিষ্ট ও অভিভূত করে, Wit করে বিস্মিত ও চমৎকৃত। অভিজ্ঞতার প্রকাশ থাকে হিউমারে, উইটে পাণ্ডিত্য। হিউমার ঘটনা-সংস্থাপন ও রস চরিত্র নির্ভর হলেও, উইট-এর দীপ্তি তীব্র, তীক্ষ্ণ ও বিরুদ্ধধর্মী বাক্য নির্ভর।[১১] আবার হিউমার ও উইটের মধ্যে উপহাস আছে, কিন্তু ব্যঙ্গের (Staire) মধ্যে আছে উপহাসের জ্বালা। ব্যঙ্গকারের উদ্দেশ্য শোধন করা, শিক্ষা দেয়া– সমাজের যত প্রকার দোষ ও অসঙ্গতি নিরসনের জন্যে রাশভারী শিক্ষক হয়ে ওঠা।[১২] কবি প্রফুল্লরঞ্জন হাসির গানে সে রকম চেষ্টা না থাকলেও, অন্য গানে সমাজের অসঙ্গতির প্রতি আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করেন, তাও ভিন্ন শৈলীতে।

০১. এঁড়ে গরু বাঘের মুখতো দেখ নাই
শুধু পাল গুতোয়ে বাছুর মেরে বেড়েছে বলের বড়াই।
ইক্ষুখণ্ড শাস্ত্রেতে কয়, চিবালে রস নির্গত হয়
সেই রসে রসিলে হৃদয়, রসিক তারে কয় সবাই;
শিখেছে বোল পাখির মতন, করো নাই চরিত্র গঠন
জোর করে চায় সাধুর আসন ভিতরে তার গুল বোঝাই।[১৩]

০২. বর্ণহিন্দুর ঠাকুর বাড়ির আঙিনায়।
অস্পৃশ্য তপশীলি জাতি তোমরা ঘোর কোন আশায়?
ওই তো ওদের ঠাকুর ঘরে জাগ্রত দেব বিরাজ করে,

তোমরা গেলে ওর ভিতরে অমনি ঠাকুর মরে যায়।

অমর মরে নরের ছোঁয়ায়, এ কল্পনা যাদের মাথায়,

তারা সবার দেবতার গায় জাতি বিদ্বেষ বিষ মাখায়।[১৪]

০৩. অধিকাংশ লোক দেখি এ দুনিয়ায়
যারা শুধু মানুষ ঠকায় তাদের কাছেই বেশি যায়।

যতবার যায় ঠগের ধারে, ঠকে তারা ততবারে

নিজের বেয়াকুপি সারে মিথ্যে কথার আল্‌পনায়।

কতক আবার আছে এমন, বোঝে না ঠকা সে কেমন

চোখ ঢাকা বলদের মতন ধাপ্পাবাজের ঘানি ঘুরায়।[১৫]

০৪. চমৎকার বিধাতার বিধান দুনিয়ায়।
দেখে শুনে ধাঁধাঁ লাগে কারণ বোঝা বিষম দায়।

স্বার্থত্যাগী নিরহঙ্কার, ব্রত যার পরোপকার,

সুযশ ভাগ্যে ঘটে না তার অপযশে কাল কাটায়।
না করে পরের সর্বনাশ, ছাড়ে না যে নাকের নিঃশ্বাস
তারি যশের মলয় বাতাস চৌদিকে ছড়ায়।[১৬]

হিউমার, উইট ও স্যাটায়ারের মধ্যে যে হাসি আছে তা অবারণ ও অকারণ নয়। কিন্তু যে হাসিতে সূক্ষ্মতর কলা-কৌশল থাকার বদলে থাকে উদ্ভট ও অতিরঞ্জিত চরিত্রসৃষ্টির চেষ্টা সেখানেই কৌতুকরসের (Fun) আধিক্য। কৌতুক যেন নিয়ম, নীতি, শৃঙ্খলাবর্জিত এক জগৎ। সেখানে সীমা, সংযম ও শালীনতার বড্ড অভাব। তবে Farce-এর মধ্যে হিউমারের কারুণ্যও নেই, উইট-এর দীপ্তিও নেই, নেই স্যাটায়ার-এর নির্মমতাও। আছে কেবল হাসির প্রবাহ।[১৭] Farce প্রহসনের বেলায় প্রযুক্ত হলেও প্রফুল্লরঞ্জনের হাসির গানে নাটকীয়তা একটি বিশেষ মৌল। এই নাটকীয়তার জন্যে তাঁর গানের অসাধারণত্ব অন্য মাত্রা এনে দিয়েছে। আমরা জানি Fun

সাধারণত স্থূল, গ্রাম্য ও আদিরসাশ্রয়ী, কিন্তু প্রফুল্লরঞ্জনের হাসির গান সে রকম নয়। তাঁর গানে হিউমার বা sense of humour আছে, আছে উইট বা উদ্ভাবনী শক্তি, নেই Fun। তবে Farce –এ আছে উইটের দীপ্তি। এ আলোকে প্রফুল্লরঞ্জনের হাসির গান বিচার করা যেতে পারে।

গ্রামীণ সমাজে এক শাশুড়ি তার পুত্রবধূর কলস ভেঙ্গে ফেলাকে কেন্দ্র করে জেরা করা শুরু করেছে। এর মধ্য দিয়ে একটা দৃশ্যপট সৃষ্টি হলেও বিষয়টি হাস্যোদ্দীপক। অঞ্চল বিশেষের ভাষায় প্রফুল্লরঞ্জনকৃত গানটির উপস্থাপন শৈলী শোনা যেতে পারে।

আস্তো নাস্তো কলসটা তুই ভাঙ্গলি ক্যামবালায়?
তোর মোতো তো দজ্জালে বউ দেহি নে এ দুনিয়ায়।
কতো করে নানান তাল ভানা
কলসটা কিনিছি দিয়ে সাড়ে ছয় আনা
তুই করে আজকে বেন্নেপানা বিসেদ্দানা দিলি ঠায়।
ঘোন্টা তুলে তালোর উপরে
পান চ্যাদরায়ে হাঁটিস নয়ডা ঠাটকের ভরে।
কোন মরদের ঘাড়ে প'ড়ে ভাঙ্গিছিস তার কেনোর ঘায়।[১৮]

পুত্রবধূ শাশুড়ির কথার পরিপ্রেক্ষিতে পড়ে যাওয়া, কানের নথি কাটার কথা বলেছে, কিন্তু যে বিষয়টি পুত্রবধূর আঁতে ঘা লেগেছে তা তার মা-বাবা নিয়ে কথা বলা। আর, তার সৎস্বভাবের প্রতি শ্বাশুড়ির কটাক্ষও পুত্রবধূর জন্যে অবমাননাকর হলেও তার কোনো কোনো কথা হাসির উদ্রেক করে।

আছাড় খায়ে পড়ে আমার কলস ভাঙ্গিছে
কলতলায় জল জম্বে জম্বে দারুণ স্যাদলা বটিছে।
কলস ভরে যেই না দিছি ঝুল
পাও পিছলেয়ে পড়ে গেলাম মাজায় নাগে ঢুল
দ্যাহো আমার উজলোয়ে চুল কানের নথি কাটিছে।
মাটে কলস না ভাঙ্গে কার
তাইতে তুমি ওথোন তুলে কচ্ছো মা-বাবার
পথে চলার ঘাড়ে পড়ার কতো ফরোম উঠতিছে।[১৯]

পল্লি গ্রামে রান্নার জন্যে বাগান থেকে কাঠ কুড়ানোর রেওয়াজ আছে। একটি বধূ প্রায়শ সে কাজটি করে। এ প্রসঙ্গে স্বামী বারবার নিষেধ করেছে, এমনকি পীর সাহেবের প্রসঙ্গ তুলে সন্তান না হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করে স্ত্রীকে বলেছে :

এ্যায়লা এ্যায়লা দা'র কুড়োতি যাস কেন বাগানে?
রোজ যে তোরে নিষুধ করি যায় না কি তা তোর কানে?

নাড়া খাড়া আছে যে কয়জন
বাগান ছেনতি পারে তারা যা'য়ে বাদাবন
তুই মাগী, যাস কিসির কারণ চাচড়ার গোড়া যেহানে। ...
নয়ডা সিয়ে করে সেদিন ব্যয়
পীর ছায়েবের কবজ আনে দিছি তোর গলায়
এবার যদি ও ছুটে যায় জব দেবো কি সেহানে।
প্রফুল্ল কয় জব দেবা কি ছাই
জবে ব্যাড়ে ওনার কিছু হবার কায়দা নাই
ওনার হইছে বাগানে বাই ধরে বইছে শয়তানে।[২০]

উত্তরে স্ত্রী যে কথা বলেছে তাতে পরিবারের বাকসর্বস্ব এবং ভোজনপটু মহিলাদের কাজ না করার কথা তো আছেই, পরন্তু সন্তানহীনতার কারণও হয়েছে বর্ণিত। ভণিতাংশে প্রফুল্লরঞ্জনের টিপ্পনী আরও হাস্যকর।

সাধে কি আর আমি অতো বাগান ছেনতি যাই?
বারো ভূতির পিণ্ডি গালবো আড় কুটো গাছ ঘরে নাই।
নাড়া খাড়া আছে যে কয়জন
কাজে কুঁড়ে ভোজে দেড়ে মুহি বেচক্ষণ
কয়ে দ্যাহো ওরা কেমন মারে মুড়ো কোঁচের ঘাই।
পীর ছায়েবের মান্দলী যে নয়
তারে দেখলি ভূত পিচেশে ছাচড়ায় করে ভয়
ঐ বলে তো সদুক সোমায় বাগান ছেনতি সাহস পাই।
পয়সা তোমার কামড়ায় কেবলি
তাইতি তুমি যোগাড় কর কবজ মান্দলী
ধারের জাগায় ধার না থাকলি তাবিজি কি করবে ছাই।[২১]

স্বামী-স্ত্রীর মারামারি ও ঝগড়া বিবাদ অশিক্ষিত গ্রামীণ জীবনের নিত্য নৈমিত্তিক বিষয়। সে ঘটনা কেমনভাবে ঘটে, সে বিষয়ে যদি প্রফুল্লরঞ্জন না লিখতেন, তাহলে কেউই আমরা জানতেও পারতাম না সে জীবনের অজানা কাহিনি-উপকাহিনি। এদিক থেকে আমাদের পরমপ্রাপ্তি যে তিনি আঞ্চলিক ভাষায় এ জাতীয় গান রচনা করেছেন। এ গানটির বিশেষ প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, মার খাওয়ার পরে স্বামীর বিরুদ্ধে দারোগার কাছে নালিশ করার দুঃসাহস। যে আমলে মেয়েদের মুখে কোনো কথাই বের হতো না, পতির চরণতল ছিলো ভবমুক্তির উপায়, সেই আমলে থানার বড়বাবুর কাছে স্বামীর বিরুদ্ধে নালিশ করার মতো দুঃসাহস কোনো প্রহৃত মহিলা দেখিয়েছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু প্রফুল্লরঞ্জন হাস্যকৌতুকের মধ্য দিয়ে নারীর প্রতিবাদী ও দ্রোহী চেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। আমরা জানি সমাজের নানা স্তরের ক্ষমতাবানদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠা চিরকালীন নিয়ম। প্রহৃত স্ত্রী যে-দারোগার কাছে স্বামীর বিরুদ্ধে নালিশ করার কথা বলেছে, সে-দারোগার সঙ্গে আছে স্বামী

দেবতার বন্ধুত্ব। সেই সূত্রে সে বলেছে সেখানে গিয়েও বিচার পাওয়া যাবে না। স্বামীর অভিব্যক্তির প্রকাশ পেয়েছে একটি চিরায়ত প্রবচনের মধ্য দিয়ে। এবং সেটি এমনই দাপুটে মনস্কতা প্রসূত যে, সেখানে মেয়েদের অধিকার হরণের কথা কেন জানি মনেই হয় না, যতখানি হাসির উদ্রেক করে।

থানায় যায়ে করবি আমার কি?
বড়বাবুর সাথে আমার দারুণ ইয়ারকি
নালিশ করে করবিনি কি ঘাই খাবিনি স্যাও জাগায়।[২২]

আমরা প্রফুল্লরঞ্জনের ৯৮৫টি গান সংগ্রহ করতে পেরেছি– তার মধ্যে হাসির গান হিসেবে সামাজিক সমস্যামূলক প্রশ্নোত্তর সংবলিত ৫৮টি, উত্তরহীন ১৯টি, বরিশালের উপভাষায় ১০টি, কাপড় প্রসঙ্গে ২টি, অসুখ বিষয়ে ৭টি, জোঁক, উকুন, ছারপোকা নিয়ে ৪টি, ঝগড়া-বিবাদহীন ২৯টি ও শরণার্থী সম্পর্কিত ৬টি গান। এ গানগুলোতে হাস্যরস সৃষ্টিতে তাঁর উপভাষা ব্যবহারের মুন্সীয়ানা প্রশংসার দাবি রাখে। আমরা জানি স্থান, কাল ও পারিপার্শ্বিক অবস্থায় যা সঙ্গতিপূর্ণ নয়, এমন বিষয় হাসির উদ্রেক করে। অন্যের বিকৃতি, ভুল, দোষ ও দুঃখে আমরা হাসি। তবে সামান্য হলেই আমরা হাসি, অসামান্য হলে সৃষ্টি হয় অনুকম্পা ও সহানুভূতির। চরিত্রগত সামান্য দোষও হাসির কারণ হতে পারে। ভান ও ভণ্ডামি হাসির একটি বিশেষ উপাদান হলেও হাস্যরসিক কোনোক্রমে সমাজের নীতিশাসক নন, নীতির পাঁচনের থেকে হাসির আসর পরিবেশনই তাঁর উদ্দেশ্য। তিনি সমাজের ফোঁড়া সারাতে চান বটে, কিন্তু নীতির অস্ত্র দিয়ে নয়, হাসির প্রলেপ দিয়ে। 'সেজন্য নৈতিকতাকে হাস্যরসিক খুব উঁচু স্থান দেন না, বরং নীতির আতিশয্যকে হাস্যরসিক পরিহাসই করেন।'[২৩]

এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, প্রফুল্লরঞ্জন হাস্যরসিকতার বিষয় নিয়ে সমাজের নীতিবাগীশের আসনে না বসলেও ছোট ছোট দোষ-ত্রুটির প্রতি যেভাবে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন, তা সত্যিকার অর্থে একজন হাস্যরসিকেরই কাজ। একটা উদাহরণ দেয়া যেতে পারে : গ্রামীণ এক মহিলা দাঁতে গুঁড়ো না নিয়ে অর্থাৎ তামাক পোড়া না নিয়ে থাকতে পারে না। কিন্তু বিষয়টি স্বামীর অপছন্দ। গুঁড়ো নেয়া দেখলেই তার গা ঘিন ঘিন করে ওঠে। এ জন্যে সে স্ত্রীকে বারবার নিষেধও করেছে। এ গানে গুঁড়ো নেয়া প্রসঙ্গে হাস্যরস পরিবেশিত হলেও কবি কিন্তু দৃষ্টি ফেলেছেন নখের কোণায়, যেখানে জমে আছে 'কয় পাল্লা ছাতা'। এই 'ছাতা'র দিকে না তাকালেও কোনো লাভ-ক্ষতির সম্ভাবনা ছিলো না। তবু এমন একটি বিষয়ের উপস্থাপনা, যা একাধারে সূক্ষ্ম ও হাস্যকর। এ জন্যে তার হাতের রান্না খেতে পতিদেবতার ভীষণ আপত্তি। এ গান ঔপভাষিক হলেও একদিকে স্বামীর সৌন্দর্যচেতনা, অন্যদিকে স্ত্রীর একটু একটু করে অনুরক্তিজাত বদভ্যাস ছাড়তে না পারার কষ্টের কথা বর্ণিত হয়েছে।

দ্যাহা দিন তোর নঙ্গুলির মাথা
নোহের কোণায় জমে আছে কয় পাল্লা ছাতা
খাতি গেলি তোর রান্ধাতা
ঘ্যান্নাতে নাড়ী মোচড়ায়।[২৪]

শুধু কী তাই? গুঁড়ো নিলে স্ত্রীর মুখের গঠন কবি বলেছেন :

একে তো মুখ টক বাগুন বেচা
গুঁড়ো নলি দেহায় যেন কুহুরির পাছা
তোরে ক'রে আজকে ইন্দুর ছ্যাচা
বান্ধে থোবো পাইখানায়।[২৫]

উত্তরে স্ত্রী যে বয়ান দিয়েছে তা হাস্যকর, কিন্তু কষ্টদগ্ধ। তার গুঁড়ো নেয়া ছাড়ানোর জন্যে সে কী কী করেছে, গুঁড়ো দাঁতে না নিলে কী কী হয়, কে কে এই অভ্যেস করিয়েছে সে প্রসঙ্গে বিস্তারিত বললেও চোখে জল না এসে হাসির উদ্রেক করে।

তামুক না পোড়ায়ে আমার থাহার কায়দা নাই
বকো ঝকো মারো কাটো আর
যা পারো এ্যারো তাই।
ছাড়ান আমি দিয়ে দেহিছি
এট্টুপরে ঠ্যাহে যেন মরিছি গিছি
শ্যাষে চাবাইছি তামুকির বিচি ভাঙ্গের পাতা হুকোর কাই।
আসল কথা কবো কি তোমায়
গুঁড়ো দাঁতে না নলি মোর মাশুড়ো টাটায়
ভাত না খালি দিন চলে যায় ওনা অলি ম'রে যাই।
ঠাউরমা আর ফেসীমা দুই কাল
সলে সলে করাইছে ওই নওয়ার ইস্তিমাল
এহোন মিছে করে সামাল সামাল দিয়ে না জল কোহে ঘাই।[২৬]

এমনিভাবে স্ত্রীর ভাত পরিবেশন, বউয়ের মুখ আন্ধারি যুত, তিনটি ইলিশ মাছ খাওয়া, সিনেমা ও বারোনির মেলা দেখতে যাবার আব্দার, কুঁড়ে স্বামীর মৃত্যু কামনা, মেচি মুখো স্বামী নিয়ে স্ত্রীর মনঃকষ্ট, বউয়ের কোনো কাজ স্বামীর পছন্দ না হওয়া, বউয়ের বাপের বাড়ি যাওয়া ও জাউ খাওয়া ইত্যাদি ঘটনার পাশাপাশি জোঁকের ভয়, ছারপোকা ও মশার কামড়, চুলকানি, দাদ, অম্বলের ব্যথা, ম্যালেরিয়া জ্বর ছাড়া বরিশালের আঞ্চলিক ভাষায় যে গানগুলো রচিত হয়েছে তা একদিকে হাস্যরসের বিষয় হলেও, জীবনের এক একটি দুর্লভ ছবি, যে ছবিতে জীবনের গভীর তলদেশ পর্যবেক্ষণ করা যায়। তাই এ গান যেন আঞ্চলিক ভাষায় রচিত ছবি ও হাস্যরসের অবিসংবাদী উপাদান। হাসি যেহেতু স্থানিক সমাজের রুচি, ধারা ও ধারণার ওপর নির্ভরশীল, তাই যে-কারণে এক অঞ্চলের লোক হাসে, সে-কারণে অন্য অঞ্চলের বা সমাজের লোক নাও হাসতে পারে। সামাজিক বা আঞ্চলিক পরিবেশের সঙ্গে ভাষা, বাকপ্রণালী, প্রবাদ, ঐতিহ্য ও রুচির মধ্যে হাসির উপাদান মিশে আছে।[২৭]

বাংলা সাহিত্যে, বিশেষত কথা সাহিত্যে ও নাটকে গ্রামীণ মানুষের জীবন ব্যবস্থা, আচার-আচরণ, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিষয় চিত্রিত হয়েছে; এমনকি কবিতাতেও সে জীবন মূর্ত হয়ে উঠলেও, গ্রামীণ ভাষায় গানের

মধ্যে এমন জীবনচিত্রের উপস্থাপন খুব কমই দেখা যায়। এবং বাংলা সাহিত্যে হাসির গান তেমনভাবে প্রকাশও পায়নি। এ রকম একটি বিষয়ের উপস্থাপন করেন লোককবি প্রফুল্লরঞ্জন। খুলনা, সাতক্ষীরা, নড়াইল ও যশোর জেলার লোককবিদের মধ্যে আঞ্চলিক বা গ্রামীণ ভাষায় গান ও কবিতা রচনার প্রবণতা লক্ষিত হলেও, কোনো কোনো দিক থেকে প্রফুল্লরঞ্জন অনতিক্রম্য। তাঁর মেধাবী ও অনন্য বাক্যবন্ধ এবং বিষয়ের প্রতি অসাধারণ দক্ষতা ও প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার প্রমাণ করে তিনি হাসির গানের একজন অন্য রকম স্রষ্টা।

অন্যদিকে, বাংলা সাহিত্যে হাসির গানে ও কবিতায় বিশেষ অবদান রেখেছেন সেই *রামায়ণ*, *মহাভারত* থেকে শুরু করে *মঙ্গলকাব্য*, *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*, বৈষ্ণব পদাবলি, চৈতন্য-চরিত সাহিত্য, নাথ-সাহিত্যের লেখক ও কবিগণ। আধুনিক যুগে বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের ধারা সমৃদ্ধ করেছেন রামপ্রসাদ সেন (১৭২৩-৭৫), কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-৫৯), প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-৮৩), দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-৭৩), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪), কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-৭০), ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯১৯), জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৮-১৯২৫), ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯১১), অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩), রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০), সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২), সুকুমার রায় (১৮৮৭-১৯২৩),কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) প্রমুখ[২৮] গানে ও নাটকের গানে হাস্যরস পরিবেশন করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন কবি, গীতিকার, নাট্যকার ও ব্যঙ্গরসাত্মক কবিতা ও গানের লেখক। স্বদেশী চেতনা বাঙালির জীবনে যে সাংস্কৃতিক জাগরণ এনেছিলো দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক, কবিতা ও গান ছিলো সেই প্রেরণার উৎস।[২৯] তাঁর হাস্যরস প্রধান কবিতার সংকলন *আষাঢ়ে* (১৮৯৯) ও *হাসির গান* (১৯০০) বাংলা সাহিত্যে অভিনবত্বের সূচক। তাঁর সংগীতের নতুনত্ব ও গায়ন রীতির চমৎকারিত্ব ভেদ করে যা উঠে এসেছে তা পরাধীন, অনুকরণসর্বস্ব ও ইংরেজ চাটুকর এক শ্রেণির বঙ্গবাসীর প্রতি তীব্র বিদ্রূপাত্মক শ্লেষাঘাত, যার পেছনে ছিলো ডি. এল রায়ের গভীর স্বাদেশিকতাবোধ।

রজনীকান্ত সেন প্রায় ৩২৩ গান রচনা করে বাংলা গানের জগতে যে স্থায়ী আসন তৈরি করেছিলেন, তা আজও অমলিন। তাঁর গান তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত : স্বদেশী গান, হাসির গান ও ভক্তিগীতি। রজনীকান্ত ও সত্যেন্দ্রনাথের হাসির গানের সৃষ্টি ডি. এল রায়ের সান্নিধ্য থেকে। রজনীকান্তের একটি গান :

যদি, কুমড়োর মতো, চালে ধরে র'ত
পান্‌থোয়া শত শত;
আর, সরষের মতো, হ'ত মিহিদানা,
বুঁদিয়া বুটের মতো!
(প্রায় বিঘা বিশ মণ ক'রে ফল্‌ত গো);
(আমি তুলে রাখিতাম); (বুঁদে মিহিদানা গোলা বেঁধে
আমি তুলে রাখিতাম);
(গোলা বেঁধে আমি তুলে রাখিতাম, বেচতাম না হে)।[৩০]

সত্যেন্দ্রনাথ 'নবকুমার' ছদ্মনামে যে পদ্য রচনা করেন তাতে প্রমথ চৌধুরীরও (১৮৬৮-১৯৪৬) প্রভাব বর্তমান।

সে প্রভাব হাসির গানের সূত্রে ক্রিয়াশীল। *হসন্তিকা*-র পদ্যগুলো হাস্যরসে উজ্জ্বল। তৎকালীন সময়ে বাংলা সাহিত্যে দেশীয় ভাব, প্রথা, আচার ও আদর্শের নামে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুসারীদের যাঁরা নিন্দা বা অভিযোগ করতেন, তাঁদের জবাব প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ রচনা করেন 'কদলী-কুসুম' নামের কবিতাটি।[৩১]

রবীন্দ্রনাথের চা-প্রেমী ও 'হৈ চৈ সংঘ'-এর পরিচয় সূচক গানে যে হাস্যরস সৃষ্টি হয়েছে তা অনবদ্য। তবে তাঁর রচনায় humour-এর চেয়ে wit-এরই আধিক্য। 'বুদ্ধিদীপ্ত অভিজাত মননশীল চিত্তবৃত্তির ছাপ তাঁর লেখার ছত্রে ছত্রে। তাই তিনি যে ব্যঙ্গাত্মক হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন তা শুধু হৃদয়গ্রাহ্য নয়– বুদ্ধিগ্রাহ্যও। ... humour and wit দুটোরই সামঞ্জস্য ও সমন্বয় তাঁর ব্যঙ্গ ও হাস্যরসাত্মক সৃষ্টির মধ্যে পাওয়া যায়।'[৩২] ঠিক এ জন্যে তাঁর লেখায় একই সঙ্গে humour ও wit-এর হয়েছে সমন্বয়।

বাংলা রসসাহিত্যের ধারা ও প্রফুল্লরঞ্জন

বাংলা রসসাহিত্যের ইতিহাসে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন একজন কবিয়াল। তাঁর সময়ে হাস্যরসের রীতিই ছিলো ব্যঙ্গমূলক। তখন পরস্পরের আক্রমণ প্রতি আক্রমণের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হতো হাস্যরসের। এ প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র ও গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের (১৭৯৯-১৮৫৯) মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাত মূলক কবিতাযুদ্ধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আর একটি উল্লেখযোগ্য নাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। উনিশ শতকের প্রথমদিকে বাঙালি মনীষীদের মধ্যে জাতীয় জীবনের ওপর যাঁরা প্রভাব বিস্তার করে আছেন, তিনি তাঁদের অন্যতম। তাঁর মতো প্যারীচাঁদেরও উদ্দেশ্য ছিলো সমাজশোধন ও নীতি শিক্ষা। ঠিক সে কারণে তাঁর হাস্যরস হয়ে পড়েছে ব্যঙ্গধর্মী (Staire)। হাসির ছলে আঘাত, ও আনন্দরসের সঙ্গে শিক্ষার কষ মিশিয়ে দেয়াই ছিলো লেখকের উদ্দেশ্য।[৩৩]

হাস্যরসের স্রষ্টা হিসেবে কালীপ্রসন্ন সিংহ বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে এক অনশ্বর প্রতিভা। তিনি ছিলেন নাট্যকার, নাট্যমঞ্চ-সংস্থাপক, কথ্যভাষার প্রবর্তক, হাস্যরসাত্মক নক্সা রচয়িতা ও মহাভারতের অনুবাদক। তাঁর *হুতোম প্যাঁচার নক্সায়* উনিশ শতকের কলকাতার জমিদার ও অবতার, ব্রাহ্ম ও পাদরি, বুড়ো ও ধেড়ে খোকা, মাতাল ও মোসাহেব, বাবু ও বাবাজী, বুকিং ক্লার্ক ও স্টেশন মাস্টার কেউই রেহাই পায়নি।[৩৪] তবে *হুতোম প্যাচার নক্সায়* কৌতুক পরিবেশিত হয়েছে কয়েকটি হুতোমী গান ও হাস্যোদ্দীপক গল্পের মধ্যে।

দীনবন্ধু মিত্রও এ ধারার অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁর মতো প্রায় কেউ হাসাতে পারেননি, এমনকি কাঁদাতেও নয়। তাঁর লেখার মধ্যে গ্রামীণ জীবনের যে প্রকাশ হয়েছে, দীনবন্ধু তাঁর সঙ্গে প্রাণসত্তা মিশিয়ে ফেলেননি শুধু, হাস্যরসিকের জীবন দিয়ে সে জীবনের তীক্ষ্ণ ও তির্যক ভাব, অর্থাৎ বাস্তব-রূপ সম্পর্কে অন্তরসন্ধানী সূক্ষ্ম-পর্যবেক্ষণ করেছেন। তিনি সে জীবনের কথা বলতে গিয়ে কল্পনার রঙের আশ্রয় নেননি; বরং বাস্তবের কাছাকাছি থেকে সে সকল মানুষের আচার-আচরণ, তাদের ভাষার প্রতিটি শব্দ, বাগভঙ্গি, প্রবাদ-প্রবচন, কুসংস্কার প্রভৃতি বিষয়, এমনকি তাদের চোখের ইশারা, মুখের ভাব ইত্যাদি বিষয়ও গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রোক্ত 'নির্মল, শুভ্র, সংযত হাস্য'[৩৫] আনয়ন করেননি, চিরবাহিত সমাজ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যে হাস্যরস সৃষ্টি করলেন, তা সার্বভৌম, বুদ্ধিবিলাসী ও নাগরিক জীবনের সামগ্রী হয়ে উঠেছিলো। সেখানে ব্রাত্যজনের প্রবেশাধিকার ছিলো না সত্যি, তবে হীরা আয়ি, গোবরার মা, ব্রহ্ম ঠাকুর,

নয়ানবৌ জায়গা পেয়েছে। বাংলা রসরচনার ক্ষেত্রে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯১৯) ও যোগেশচন্দ্র বসুও (১৮৮৫-১৯৩৩) একটি বিশেষ ধারার প্রবর্তক। তবে এ ধারায় শরৎচন্দ্রও (১৮৭৬-১৯৩৮) কম নন। তাঁর হাস্যরস হিউমারধর্মী হলেও, আছে ব্যঙ্গের উপস্থিতি। আর, প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) বীরবলের রসিকতা আত্মসাৎ করে হয়ে উঠেছিলেন সাহিত্যসভার বিদূষক। তাঁর প্রকৃতির মধ্যে ছিলো বাগবৈদগ্ধ, মজলিশি ঢঙ ও অভিজাত মানসিকতা। বিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধি ও হৃদয়ের বন্ধনে ছিলেন পরিপূর্ণ। প্রমথ চৌধুরীতে ছিলো উইট, শরৎচন্দ্রে হিউমার, আর, রবীন্দ্রনাথে উইট ও হিউমারের যুগলবন্দী।[৩৬] এঁদের পর্যায় উত্তীর্ণ করে আমরা দেখতে পাই কবি কালিদাস রায়কে (১৮৮৯-১৯৭৫)। হাস্যরস সৃষ্টিতে তিনি বিশেষ অবদান রাখলেও প্যারোডি ও ব্যঙ্গরচনায় সজনীকান্ত দাসের (১৯০০-৬২) শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। সকল আর্টের মতো ব্যঙ্গের আর্টও প্রচ্ছন্নতা ও ছদ্ম আবরণের মধ্যে সার্থক ও প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে তাঁর রচনায়।

সেই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত থেকে শুরু করে বাংলা সাহিত্যের মোটা দাগের কবি ও সাহিত্যিকদের হাস্যরস সৃষ্টির যে খতিয়ান পাওয়া গেছে তার মধ্যে কেউ আক্রমণ প্রতি আক্রমণে, কেউ অযোগ্যতা, ভণ্ডামি ও প্রতারণার প্রতি বিরক্ত, কেউ বাস্তবের কাছাকাছি জীবনাচরণ, ভাষা, প্রায়োগিক শব্দ, বাগভঙ্গি, প্রবাদ প্রয়োগের মাধ্যমে, কেউ হাস্যরসের মধ্যে নির্মল ও সংযত হাসির মধ্যে, কেউবা অদ্ভুত কাহিনি ও উদ্ভট চরিত্র চিত্রণে, কেউ মাইকেলি নামধাতু ও অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রয়োগে, কেউ হাস্যকর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রয়োগে, কেউবা হিউমার ধর্মী রঙ্গরস উপস্থাপনে, কেউ প্যারোডি রচনা করে বাঙলা সাহিত্যে হাস্যরসের ধারায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। লোককবি প্রফুল্লররঞ্জন বিশ্বাস কিন্তু উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কবিদের উত্তরসূরি হিসেবে কোনো বাঁধানো পথে হাঁটেননি। তাঁর রচিত গানে কোনো প্রকার রঙ্গব্যঙ্গের, কারো প্রতি আক্রমণের কোনো মনোভাবই নেই। এমনকি, নেই প্যারোডি রচনার মতো কোনো চেষ্টাও। তিনি নির্মোহভাবে গ্রামীণ মানুষের নিত্যদিনের জীবনসমস্যার স্বরূপ এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন, সেটিই তাঁর স্বাতন্ত্র্যের সূচক। তবে দীনবন্ধু মিত্রের ভাষা, প্রবাদ-প্রবচন, প্রায়োগিক শব্দ, জীবনাচরণ প্রভৃতির সঙ্গে প্রফুল্লরঞ্জনের হাসির গান বা হাস্যরসাত্মক গানের সাদৃশ্য আছে মনে হলেও, আসলে কারো রচনার এতটুকু অনুকৃতির কোনো চিহ্নই প্রফুল্লরঞ্জনের গানে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। বাংলা সংগীত ও কবিতার অঙ্গনে প্রফুল্লরঞ্জন এদিক থেকে একজন লোককবি হিসেবে স্বরূপত স্বতন্ত্র।

এবং স্বাতন্ত্র্য

এ স্বাতন্ত্র্য শুধু নাটকীয়তায় নয়, বা ঔপভাষিকও নয়, এমনকি মানুষের আচার-আচরণ ছাড়াও অসুখ, ধরা যাক, দাদ, অম্বলের ব্যথা, বাতের ব্যথা, বৃদ্ধের মাজার ব্যথা ও চুলকানির মতো বিষয় ছাড়া একশো পঁয়ত্রিশটি গানের বিষয় বিন্যাসেও আলাদা। আলাদা অন্যের থেকে। আর, চুলকানি নিয়ে গান লেখা যায়, যা হাস্যরস ও অশ্রুজলে একাকার হয়ে যেতে পারে, তার দৃষ্টান্তও প্রফুল্লরঞ্জন বিশ্বাসের গান।

> চুলকানির জ্বালাতে আরতো বাঁচিনে প্রাণে
> আমার এখানে চুলকোতি গেলি চুলকোয়ে যায় ওখানে।

একেতো গরমের জ্বালা তাতে আবার ওনার ঠ্যালা
দুই বিপদে কাছা খোলা কুলোয় না আর জীবনে।
চুলকোয়ে আর কত পারি আচা থুয়ে ঝিনেই ধরি
মা মোনোসা আল্লা হরি দেখলো না কেউ নয়নে।
যার কাছে কই ওষুধ খুঁজি সেই জানে এর কবিরাজী
শেষে দেখি সেই দরজী পথে বসে কুক টানে।[৩৭]

চুলকানি বিষয়ে আরও একটি গান আছে তাঁর। এ গানে চুলকানির কষ্টের পাশাপাশি ছেলে-মেয়েদের চুলকানির প্রসঙ্গটি হাস্যরসাত্মক হলেও চোখে জল এসে যায়। এখানেই হাসির গানে অন্যান্য কবিদের সঙ্গে প্রফুল্লরঞ্জনের সাদৃশ্য। স্ত্রীকে পুজোয় স্বামী ভালো কাপড় দিতে চেয়েছিলো, যা পরে স্ত্রী পুজো দেখবে। কিন্তু স্বামী যে কাপড় দিয়েছে তার বর্ণনা স্ত্রীর মুখ থেকে শোনা যেতে পারে :

পুজোর সময় ভালো কাপড় দিতি চাইছিলে।
এই বুঝি সেই ভালো কাপড় কোন চোখ দিয়ে চিনিলে?
সিটকেনে পাড় বুন্যি বেখাস্তা
বৈরেগীরা বানায় এদে চাল থোয়া বাস্তা
এই হেন বুঝি পা'য়ে সস্তা ভালোফাসে আনিলে।
ভাবতিছি এই অনেক দিন ধ'রে
পুজো দেহে বেড়াবো ঐ কাপড় হান ফরে
সখডা দিলে মাটি অরে অন্তরেও দাগ দিলে।[৩৮]

স্বামী তার উত্তরও দিয়েছে অভাবের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে। আরও বলেছে ভালোবাসা হলো অন্তরের বিষয়। তাকে কাপড় দেয়া থোয়ার মধ্যে টেনে আনা কেন? আরও পৌরাণিক কাহিনির উল্লেখ করে সীতা সাবিত্রীর উদাহরণ দিয়ে বউয়ের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করেছে।

এ পুজোতে ভালো কাপড় দেব ক্যামবালায়
বোছোর ভ'রে কিনে খাওয়া– তাল সামলানো বিষম দায়। ...
তুই ধরিছিস কাপড়ের বয়ান
গাছের বাকল প'রে সীতা সাবিত্রী পায় মান
পতির পরে যার আছে টান সে কি ভালো কাপড় চায়?
ভালোফাসা অন্তরের জিনিস
কাপড় ক্যাথার মধ্যি তারে ক্যান টানে আনিস,
তোর ভালো তো তুই বুঝিছিস, আমার ক'দিন কি উপায়?[৩৯]

রাসের সময় হলদির চরে স্নান করতে যাওয়া দীর্ঘদিনের রেওয়াজ। সাধক হরিভজন পাগল এ উৎসবের গোড়া পত্তন করেন। ডাকাতের ভয় উপেক্ষা করে সেই রাস উৎসবে যাওয়া বিষয়ে প্রফুল্লরঞ্জনের গানটি অবিমিশ্র

আনন্দ বেদনার ফলশ্রুতি।

গত বোছোর রাসের সোমায় অলদির চরে যা'য়ে লো ভাই
যে দৌরাত্যি অয়ে গেছে সে কতা আর কারে জানাই।
আগুন জলের তিন মোহনায় ডায়াত পোলো আমাগে নায়
পরানের দায় দিদি শেষে ধরে দেলাম যা ছেলো তাই।
খাজো এট্টা ডায়াত আ'সে গুতো মারলো কোঁয়ের পাশে
এক পোড়ালী নিয়ে গেলো আংটা ভাঙ্গা লোহার কড়াই।[৪০]

এক সময় সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষের ধান রোয়ার পরে তাদের ছিলো দীর্ঘ অবসর। এ সময়ে আয়েস করে যেত সাগরে পাংগাস মাছ ধরতে। সুস্বাদু সেই পাংগাস মাছ সম্পর্কে প্রফুল্লরঞ্জনের হাসির গান :

পাংগাস মাছের প্যাটের মাছে ভগবানের অংশ আছে
এমনি কলে রেঁন্ধে দেবো মাছ থুয়ে হাত চাটতি চাবা।
ত্যাল যদি অয় ঐ পাংগাসে নাল টোপাবে গাসে গাসে
মাছের পাছে মাসে মাসে বাড়ি থুয়ে দূরে রবা।[৪১]

বুতের বিলের কই মাছ প্রসঙ্গে প্রফুল্লরঞ্জনের আছে একটি অসাধারণ গান। কই মাছ খাওয়ার জন্যে প্রাণেশ্বরের কাছে প্রাণেশ্বরীর আব্দার :

শুনিছি সে এক বিঘেতে কই
ঝোলে ঝালে ভাজায় ভাতে সব তাতে জুতসই
শুনে ইস্তি তোমারে কই হইছে নাড়ী খেমচি জ্বর।
সত্যি যদি আমার ভালো চাও
মা'রে পারো কিনে পারো মাছ আনে খাওয়াও
কামাই পাইছো আজ চলে যাও জীবন আমার আলের 'পর।[৪২]

এ গানগুলো শোনার পরে আমাদের মনে হয়েছে, প্রফুল্লরঞ্জনের রচিত এ গান গ্রামীণ জীবনের নিত্য দিনের জীবননিষ্ঠ বিষয় এবং একটি অভিনব সংযোজন, যা বাংলা সাহিত্যের একটি বড় সম্পদও। এ গানের সঙ্গে অন্যদের তুলনা করতে গিয়ে একটি কথা মনে রাখতে হবে : দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, সত্যেন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম ও অন্যান্য কবিদের হাসির গান ও কবিতা বুঝতে গেলে, সবার জন্যে না হলেও, অনেকের ক্ষেত্রে ইতিহাস জ্ঞান আবশ্যক। তাছাড়া, থাকতে হবে এ বিষয়ে বিশেষ ধারণা। কিন্তু প্রফুল্লরঞ্জনের গানের বিষয় বুঝতে গেলে আঞ্চলিক ভাষা বুঝতে পারলেই হলো। তৎকালীন সময়ে উচ্চশিক্ষার বৈগুণ্যে সমাজে ইংরেজ প্রীতি, পরাধীনতা, অনুকরণসর্বস্বতা প্রভৃতির প্রতি কবিগণ তীব্র শ্লেষাঘাত করেছেন। প্রফুল্লরঞ্জনের গানে সে রকম বিদ্রূপ বা শ্লেষের ব্যবহার নেই। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৬-১৯২৩) ও স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৪-১৯১৮) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গান আসরে শুনে যথাক্রমে মন্তব্য করেন, 'এতো হাসির গান নয়

দ্বিজেন্দ্রবাবু, এ যেন কান্নার গান' ও 'এ কি হাসির গান? এ যে Cruelest Tragedy।'[৪৩] কিন্তু প্রফুল্লরঞ্জনের গান বাংলা সাহিত্যের রঙ্গমঞ্চে অপাংক্তেয়দের জীবনচিত্র। এর মধ্যে যে ছবি আছে সে ছবিতে শুধুই মানুষ ও মানুষের অতি সাধারণ জীবনের অভাব-অনটন, আচার-আচরণ, ক্ষোভ ও ভালোবাসা, দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর পছন্দ-অপছন্দ নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ, অন্তর্দ্বন্দ্ব-বহির্দ্বন্দ্ব প্রভৃতির প্রকাশ ঘটেছে। প্রফুল্লরঞ্জনের উদ্দেশ্য ছিলো এদের জীবনের ছবিটি তাদের স্বভাষায় স্বঅভিব্যক্তিতে অকৃত্রিমভাবে প্রকাশ করা। এ প্রসঙ্গে নরেন্দ্রনাথ রায়কে লেখা একটি চিঠিতে তিনি বলেন : আমি অবজ্ঞাত, অবহেলিতদের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার কথা সরল সহজ ভাষায় প্রকাশ করিয়াছি। প্রথম হইতে শেষ গানটি সকল মনে আনন্দ পরিবেশন করিয়াছে।[৪৪] তিনি সামাজিক অসংগতি মূলক যে গান লিখেছেন, সেখানেও হাস্যরস বর্তমান। তবে গ্রামীণ জীবনের মানুষ ও মানুষের বিভিন্ন বিষয়, যা শহুরে বা আধুনিক মানুষের কাছে কোনো কিছুই বলে মনে হয় না, তাঁর এ হাসির গান বা কমিক গানে সেই না জানা বিষয়গুলো অধিক মাত্রায় প্রকাশিত হয়েছে। এমনকি, দেশত্যাগের মতো একটি মর্মন্তুদ ও অবিসংবাদিত বিষয়ও এ গানের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। ডি. এল. রায়, রজনীকান্ত, সত্যেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য কবিদের কবিতা বা গানের ভাষা কিন্তু আঞ্চলিক নয়। মান ভাষায় মানী লোকের যতটুকু মান রাখা যায়, কিংবা বিদ্রূপ করা যায়, তাঁরা তা করতে কসুর করেননি। প্রফুল্লরঞ্জন সে রকম মান রাখা না রাখার বিষয়ে তো যানই নি; বরং গানের ভাষার পুরোটাই আঞ্চলিক উপভাষায় প্রকাশ করে একটি অন্য রকম নির্মিতির স্রষ্টা হয়ে উঠেছেন। এ ভাষায় গ্রামীণ মানুষের অন্তর্জাগতিক জীবন ব্যবস্থার যে কলমী ছবি এঁকেছেন, তা একদিকে যেমন সর্বজনীন, অন্যদিকে অভিনবত্বের কারুকাজে এক বিস্ময়কর সংযোজন।

উপসংহার

কাজী নজরুল ইসলাম *চন্দ্রবিন্দু* কাব্যে কয়েকটি 'কমিক গান' রচনা করেন। সে গান ও কবিতাগুলোতে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয় হিসেবে প্যাক্ট, সর্দা-বিল, লীগ-অব-নেশন্, ডোমিনিয়ন স্টেটাস্, রাউন্ড-টেবিল-কনফারেন্স, সাইমন কমিশনের রিপোর্ট ও প্রাথমিক শিক্ষা বিল প্রসঙ্গে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-ঠাট্টা-তামাসার ছবি অঙ্কিত হয়েছে। এ কাব্যে ইতিহাস, বিশেষ করে রাজনৈতিক ইতিহাস থাকায় গ্রন্থটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাজেয়াপ্ত (অক্টোবর, ১৯৩১) হয়।[৪৫]

এ কাব্যের কবিতা ও গানগুলো ব্যঞ্জনাময় ইঙ্গিতের সাহায্যে মর্মভেদী ও গা জ্বালা করা টিপ্পনীতে যে শিল্পগুণের প্রকাশ ঘটেছে তা ইতিহাসের একটি বিশেষ অধ্যায়। এ কবিতার মধ্যে আছে বুদ্ধির ঝলকানি। অন্যদিকে প্রফুল্লরঞ্জনের গানে যুগপৎ Wit ও শিল্পগুণ বর্তমান। কেননা, তাঁর বলার কৌশল এমনই রসমণ্ডিত এবং চমৎকার যে, তা শ্রোতৃমণ্ডলীকে আকৃষ্ট করবেই। কারণ,

> Wit শব্দ বা অর্থ-ব্যঞ্জনায় হাস্যরস উদ্রেক করে, Humour (মুক্ত-হাস্য) সমস্ত অনুভূতিকে আন্দোলিত করিয়া সহানুভূতিশীল হৃদয়ে আবেদন জানায়। Wit বুদ্ধিমত্তা ও পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক, Humour যাহা অদ্ভুত, তাহাকে সস্নেহভাবে গ্রহণ করে। Humour-এ আঘাত বা আক্রোশ নাই, প্রসন্ন আনন্দ-বোধ বা বেদনা-বিধৌত নির্লিপ্ত হাসির ব্যঞ্জনা আছে। এই Humour আবার করুণ রসাশ্রিত হইলে সর্ব্বাপেক্ষা সুগভীর ও উচ্চস্তরে উন্নীত হয়। প্রতিকারহীন দৈন্য-দুর্দ্দশার মধ্যেও লেখক যখন ব্যক্তিগত জীবনের গভীর বেদনাকে

> জীবনের প্রতি কোন অভিযোগ বা আক্ষেপহীন ভাব দৃষ্টির সাহায্যে পাঠকের মনে রস-সঞ্চার করে, তখন এই শ্রেণীর হাস্য-রস সৃষ্টি হয়। লেখকের হাস্যোচ্ছল লঘুতায় তখন বেদনার সকরুণ দীপ্তি রামধনু সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে– তাই তাঁহার হাসির পশ্চাতে অশ্রুবিন্দু ঝলমল করিয়া উঠে।[৪৬]

প্রফুল্লরঞ্জন বিশ্বাসের এ গানগুলো Humour ও Farce বা হাস্যাত্মক নাটকীয়তার যুগলবন্দী। অনেক আলঙ্কারিকের ধারণা, কৌতুক গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট। কিন্তু যাকে 'গ্রাম্যতা' নির্ভর রচনা বলা হচ্ছে তা কী সত্যি দুষ্ট? গ্রামীণ বিষয় নির্ভর রচনা বাংলা সাহিত্যে থাকলেও, প্রফুল্লরঞ্জন গ্রামীণ বা আঞ্চলিক ভাষায় যে চিত্র এঁকেছেন, সে বিষয়ে কোনো আলঙ্কারিক এতটুকু ভেবেছেন কিনা সন্দেহ। তাছাড়া, এ বিষয়টি বাংলা সাহিত্যে এমনই আনকোরা যে, স্বতন্ত্র আলোচনার দাবি রাখে। বাংলা সাহিত্য এমনিতে হাস্য-রসের দিক থেকে যথেষ্ট ঋদ্ধ নয়। আর, যে হাস্যরস পরিবেশিত হয় তা খানিকটা জৈব ও যৌন বিষয় সংশ্লিষ্ট। সত্য, সুন্দর ও নির্মল হাস্যরসের বড়ই অভাব। প্রফুল্লরঞ্জনের গানে খানিকটা হলেও, অঞ্চল বিশেষের ভাষায় রচিত, গ্রামীণ খেটে খাওয়া শোষণক্লিষ্ট মানুষ, এবং যে মানুষই লোকসংস্কৃতির ধারক-বাহক, তাদের জীবনচিত্র উপস্থাপনের মাধ্যমে সে অভাব নিরসন করা যেতে পারে। এ দিক থেকে বলা যায়, প্রফুল্লরঞ্জন আঞ্চলিক ভাষার গান, কিংবা হাসির বা কমিক গান বাংলা হাসির গানের ইতিহাসে প্রচলিত ধারায় রচিত না হলেও তা যেমন অনুকৃতিহীন একটি বিশেষ সৃষ্টির মর্যাদা পাবে, তেমনি স্বাতন্ত্র্যের জন্যে পাবে আলাদা স্বীকৃতি। লোকগানের ইতিহাসে এ জাতীয় ব্যতিক্রমী সৃষ্টি একটুখানি জায়গা পেলে বহুমাত্রিক গানের রচয়িতা হিসেবে লোককবি প্রফুল্লরঞ্জন বিশ্বাস তাঁর লোকগানের সম্ভার নিয়ে যুক্ত হতে পারবেন লোকসংস্কৃতির অঙ্গনে।

তথ্যনির্দেশ

১. William McDougall তাঁর গ্রন্থে সাত প্রকার হাসির কথা উল্লেখ করেন।
অজিতকুমার ঘোষ, *বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা*, কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, ২০১৫, পৃ. ১

২. তদেব, পৃ. ১

৩. *The Expression of the Emotions* by Chaeles Darwin, তদেব, পৃ. ২

৪. ঈষদ্বিকাসি নয়নং স্মিতং স্যাৎ স্পন্দিতাধরং।
কিঞ্চিল্লক্ষ্য দ্বিজং তত্র হসিতং কথিতং বুধৈঃ ।
মধুর স্বরং বিহসিতং সাংসশির কম্পমবহসিতং।
অপহসিতং সাস্রক্ষং বিক্ষিপ্তাঙ্গং ভবত্যতিহসিতম্।
তদেব, পৃ. ৩

৫. তদেব, পৃ. ৭-৮

৬. সে পাণ্ডুলিপি বর্তমান লেখকের কাছে সংরক্ষিত আছে

৭. সুরঞ্জন রায়, 'বিজয় সরকার ও প্রফুল্লরঞ্জনের গানের বৈচিত্র্য ও বিষয় সমতা' *বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ষান্মাসিক বাংলা পত্রিকা*, ত্রিত্রিংশ বর্ষ, ১ম ও ২য় যুক্ত সংখ্যা, ২০১৫। পৃ. ২১-৪৫

৮. বিজয় সরকার, *বিজয়গীতি*, কলকাতা, লোককবি প্রকাশন, ১৯৯৮, পৃ. ১৭২-৭৩

৯. 'কইসণি হালো ডোম্বী তোহো রি ভাভরীআলী ।'

'ডোম্বিত আগলি নাহি ছিণালী ।'

অতীন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, *চর্যাপদ*, ঢাকা, কথাশিল্প প্রকাশন, ২০১৮, পৃ. ১১৮

১০. অজিতকুমার ঘোষ, *বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা*, পৃ. ২৭

১১. তদেব, পৃ. ৩০

১২. তদেব, পৃ. ৩২

১৩. প্রফুল্লরঞ্জন বিশ্বাসের অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি

১৪. তদেব

১৫. তদেব,

১৬. তদেব,

১৭. অজিতকুমার ঘোষ, *বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা*, পৃ. ৩৪-৩৫

১৮. প্রফুল্লরঞ্জন বিশ্বাসের অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি

১৯. তদেব,

২০. তদেব,

২১. তদেব,

২২. তদেব,

২৩. অজিতকুমার ঘোষ, *বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা*, পৃ. ১৫

২৪. প্রফুল্লরঞ্জন বিশ্বাসের অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি

২৫. তদেব,

২৬. তদেব,

২৭. অজিতকুমার ঘোষ, *বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা*, পৃ. ২৩

২৮. এঁরা ছাড়া, এ ধারায় গান ও কবিতা লিখেছেন : শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর) (১৮৮১-১৯৬৯), নবদ্বীপ হালদার (১৯১১-৬২), তুলসী লাহিড়ি (১৩০৩-৬৬), রঞ্জিত রায়, কালিদাস রায়, সজনীকান্ত দাস ও যশোদাদুলাল মণ্ডল। দাদাঠাকুর ভোট নিয়ে লিখলেন : ভোট দিয়ে যা/ আয় ভোটার আয় ।/ মাছ কুটলে মুড়ো দিব/গাই বিয়োলে দুধ দিব/ সুদ দিলে টাকা দিব/ ফি দিলে উকিল হব/ চাল দিলে ভাত দিব/ মিটিং-এ যাব না/ অবসর পাব না/ কোনো কাজে লাগব না/ জাদুর কপালে আমার ভোট দিয়ে যা।

স্বপন সোম, 'বাংলা হাসির গান ও প্যারডি,' সৌমিত্র লাহিড়ী সম্পাদিত, *বাংলা সংগীত মালা ১৪১৪*, পৃ. ১৭৩

২৯. *দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নির্বাচিত হাসির কবিতা*, ভূমিকা, পৃ. ৬

৩০. ড. গৌরী দে, *রঙ্গ-ব্যঙ্গ সংগীত*, কলকাতা, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৮, পৃ. ২১৬

৩১. রসনার তৌলে করি সৌন্দর্য বিচার,
(ও গো) সমালোচকের দল! প্রসীদ এবার।
"অন্ধ অনুকারী" যত বঙ্গ কবিবর,
(আহা) তাই হয় নাই মোচা তোমার আদর।
উদয় হয়েছে চাঁই এবে অকস্মাৎ,
(জোরে) চেঁচায়ে যে ক'রে দিতে পারে বাজীমাৎ।
স্বভাব-কবি সে নহে– স্বভাব ক্রিটিক,
(ঠিক) টিক্‌টিকি সম সদা করে টিক্‌টিক।
নিয়েছে সে তোর দিক 'উপেক্ষিতা' বলি'
(মরি) তোমারে মাথায় করি' ফিরে গলি গলি।
হামেশা ফুকারি' ফিরে হামবড়া-চাঁই,
(বলে) 'হাম্বা' রবের বাড়া বে আর নাই।
হরপ্রসাদ মিত্র, *সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যরূপ*, কলকাতা, মুকুন্দ পাবলিশার্স, ১৯৬৪, পৃ. ১৮২-৮৩

৩২. ড. গৌরী দে, *রঙ্গ-ব্যঙ্গ সংগীত*, পৃ. ৮১

৩৩. অজিতকুমার ঘোষ, *বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা*, পৃ. ২১৯-২০

৩৪. তদেব, পৃ. ২২৫

৩৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *আধুনিক সাহিত্য*, ঢাকা, কথাকলি, ১৩৭৭, পৃ. ১০

৩৬. অজিতকুমার ঘোষ, *বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা*, পৃ. ৩০৮

৩৭. প্রফুল্লরঞ্জন বিশ্বাসের অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি

৩৮. তদেব,

৩৯. তদেব,

৪০. তদেব,

৪১. তদেব,

৪২. তদেব,

৪৩. প্রসূন মাঝি, 'ওই মহাসিন্ধুর ওপার থেকে : দ্বিজেন্দ্রলাল রায়,' সুব্রত রায়চৌধুরী সম্পাদিত, *তথ্যসূত্র*, পৃ. ১১৯

৪৪. প্রফুল্লরঞ্জন বিশ্বাসের চিঠিপত্র, চিঠি নং ৩৪। তারিখ : কুলটিয়া, ১৫ ফাল্গুন ১৩৬৩

৪৫. শিশির কর, *ব্রিটিশ শাসনে বাজেয়াপ্ত বাংলা বই*, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৯৮৮, পৃ. ২৯৪

৪৬. শ্রীশচন্দ্র দাস, *সাহিত্য-সন্দর্শন*, ঢাকা, পৃ. ২১৯-২০